নিয়মিত কলাম

রাগ, অনুরাগ

আমি কেন বিএনপি-কে ভোট দিব না

আলম খোরশেদ

গত ১৫ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আগামী সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। এরই মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণাও বেশ জমে উঠেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এই নিবন্ধকারও নির্বাচন ও তার ভোটাধিকার বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বর্তমান রচনায় এবং এই কলামের আগামী কয়েকটি কিস্তিতে তার সেই সব চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন ঘটবে। বর্তমানে যদিও প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার নেই, তবে যদি সে সুযোগ থাকতো তাহলে আমি কাকে ভোট দিতাম কিংবা দিতাম না, তা ব্যাখ্যা বিশে-ষণসহ পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করার উদ্দেশ্যেই এই সিরিজের অবতারণা। এই সুযোগে আমি প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের পক্ষ থেকে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অচিরেই তাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও উত্থাপন করছি।

সে যাক, এই নিবন্ধের শিরোনাম থেকেই পরিস্কার যে আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংক্ষেপে বিএনপি-কে এবার ভোট না দেবার ব্যাপারে মনস্থির করেছি। আর কারণগুলো নিচে একে একে উলে-খিত হলো ।

এক. বিএনপি কোন ঐতিহ্যবাদী রাজনৈতিক দল নয়। সেনাবাহিনীর একজন উচ্চাভিলাষী অফিসার কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট-এর ভেতরে প্রতিষ্ঠিত এই দলটির নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক ইতিহাস, আদর্শ, আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কিংবা গণভিত্তি ছিল না। উপরন্তু এই দলের প্রতিষ্ঠাতাই একদা দম্ভভরে উচ্চারণ করেছিলেন, 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ইন বাংলাদেশ।' যা কোন নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হতে পারে না।

দুই. এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা, তা যত বিতর্কিতই হোক না কেন, হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেই যে চার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল সেগুলোকে সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে খোদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এর একজন ঘোষিত ও কট্টর বিরোধী শাহ্ আজিজুর রহমান কে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে প্রকারান্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধকে অপমান ও অস্বীকার করেছিলেন।

তিন. ১৯৭৫-এ শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসের সেই নৃশংসতম হত্যাকান্ডের নায়কদের বিচারের পথ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রুদ্ধ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, বিদেশে তাদের উচ্চ পদে আসীন করে পুরস্কৃতও করেছিলেন।

চার. ১৯৭৫-এর তথাকথিত সিপাহী-জনতার বিপ-বের ডামাডোলে পড়ে যখন প্রাণ হারাতে বসেছিলেন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা তখন যে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল তাহের তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, তাকেই তিনি অচিরেই বেআইনীভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নিজেকে একজন নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

পাঁচ. সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত দল বিএনপি-র বর্তমান নেত্রীও তাদের অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করে একের পর এক নীতিহীন রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন, যার মধ্যে উলে-খযোগ্য, তার স্বামীর হত্যাকান্ডের সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত স্বৈরাচারী একনায়ক এরশাদের সঙ্গে সখ্য, যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তিনি তাকে পদচ্যুত করেছিলেন এবং তার শাসনামলের ছয় বছর জেলের ভাত খাইয়েছিলেন। তো এহেন ব্যক্তির সঙ্গেই আবার তিনি ঐক্য করে এক মঞ্চে উঠতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, শুধু তাই নয় তার নিজেরই দায়ের করা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে এরশাদের সাজা হলে তিনি তাকে সহানুভূতি জানিয়ে তার প্রতিবাদ এবং মুক্তি দাবী করেছেন। ক্ষমতা লোভে সুনীতি, সুরুচি সম্ভ্রম কিছুই বিসর্জন দিতে বাকি রাখেন নি।

ছয়. দলের প্রতিষ্ঠাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমানে নেত্রীও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের ঘোষিত বিরোধীতাকারী জামাতে ইসলামী এর সঙ্গে ঐক্য রচনা করে তাদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থানটুকু আরও পাকা করেছেন। একাত্তরের ধিকৃত খলনায়ক কুখ্যাত গোলাম আজম-কে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন জিয়া আর তার সুযোগ্য সহধর্মিনী তাকে তার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে এক মঞ্চে উঠে জনসভা করে মুক্তিযুদ্ধের অগুনতি শহীদদের অপমান করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেননি, বা এখনও করছেন না একাত্তরের আরেক নরঘাতক রাজাকার প্রধান মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে।

সাত. বিএনপির বর্তমান নেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম-এর লেশমাত্র প্রভাব না থাকলেও, 'ইসলাম বিপন্ন' বলে ধর্মের রাজনীতির ধুয়ো তুলতে তিনি কুণ্ঠিত নন মোটেও তার জন্য বাংলাদেশের কট্টর মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক ইসলামী গোষ্ঠী সমূহের প-্যাটফর্ম ইসলামী ঐক্য জোট এর সঙ্গে ঐক্য করতেও তিনি পিছপা নন, যাদের কেউ কেউ কিনা নারী নেত্রীত্বেই বিশ্বাস করে না। তবু তিনি তাদের সঙ্গে একত্মতা ঘোষণা করতে লালায়িতই নন শুধু তাদের এক নাটের গুরু, শায়খুল হাদিস আজিজুল হক, যার প্রত্যক্ষ মদদে মসজিদের অভ্যন্তরে পুলিশ খুন করা হয়, এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে এক মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করতেও তার বাধে নি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক নম্বর ধ্বজাধারী বিএনপির নেত্রী, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে উলুধ্বনি শোনা যাবে বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, নিজেই আবার সংখ্যালঘুদের ভোটের লালসায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে উলুধ্বনি শুনতে যান সোৎসাহে। হায় সেলুকাস!

আট. বিএনপির রাজনীতির আরেক তাস ভারত বিরোধীতা যদিও তা স্রেফ মৌখিক এবং দ্বিমুখী। ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারতের নি:শর্ত তোষামোদী আর ক্ষমতার বাইরে এলেই অকারণ ও অযৌক্তিক বিরোধিতা। তা নইলে বিএনপি এত বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন কেন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা, ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গার পানি বন্টন ইস্যু এবং সীমান্ত সংঘাত ও ভূমি অপদখলের কোন সুরাহা করেননি ? আর এখন পাদুয়া ও রৌমারীর ঘটনার পর সরকারের সমালোচনা করছে গলা ফাটিয়ে। সেই সঙ্গে ভারত বিরোধিতার আওয়াজ তুলছেন উচ্চকণ্ঠে! অথচ এই নেত্রীই না তার শাসনামলে দিল-ীর এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ফারাক্কার প্রসঙ্গেটুকু উত্থাপন করতেই ভুলে গিয়েছিলেন। তাদের সময়েই না খোলাবাজার নীতির দৌলতে ভারতীয় পণ্যে বাংলাদেশ সয়লাব করে দিয়ে আমাদের নিজস্ব অর্থনীতিকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়োছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের

সঙ্গে পরস্পর সম্প্রতি সম্পর্ক নির্মাণ করে আলাপআলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমূহের সমাধান না করে সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে ভারত বিরোধিতার জিগির তোলা কোন নীতিবান রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী হতে পারেনা।

নয়. একই কীর্তি তারা করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এর সমস্যার অন্যতম প্রধান স্থপতি খোদ জিয়া যিনি সমতল ভূমি থেকে বাঙালী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গিয়ে ঢালাও ভাবে তাদের বসতি স্থাপন করার সুযোগ করে দেন পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠির মানুষদের মাঝখানে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রোপণ করেন বিরোধ, বিভেদ, অবিশ্বাস ও সন্ত্রাসের বীজ যা কালক্রমে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতা আদায়েন ও স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়। বিএনপি তাদের দীর্ঘ শাসনামলে এই সমস্যা সমাধানের কোন রাজনৈতিক উদ্যোগ না নিয়ে বরং সামরিক সংঘর্ষের পথ বেছে নেয়। যার ফল স্বরূপ অগুনিত সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রাণহানি ও সম্পতি বিনষ্টি ঘটে এবং পাহাড়ি সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ দেশত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগ সরকার এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে, রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটালে, বিএনপি তা সমর্থন করা দূরের কথা, এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের অধীনস্থ হবে বলে তার অপপ্রচার শুরু করে এবং তার বিরোধিতায় রোডমার্চ ও হরতাল পর্যন্ত করে। নীতিহীন রাজনীতির এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

দশ . বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া প্রায়শই আওয়ামী লীগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দেয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেন, অথচ সেইসঙ্গে নির্বিঘ্নে ভুলে থাকেন কপর্দকহীন অবস্থায় তার রাষ্ট্রপতি স্বামীর অপঘাতে মৃত্যুর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তার যুবক পুত্রের রাতারাতি কোটিপতি ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত তার ভ্রাতার বিপুল বিত্ত অর্জনের পন্থাটিও ঠিক পরিস্কার নয় আমজনতার কাছে। এমতাবস্থায় তার মুখে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ কি মানায় আদৌ!

এগার. বিএনপি গণতান্ত্রিক দল বলে দাবী করে থাকে নিজেদের। অথচ গত নির্বাচনের পরাজয়কে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে নি তারা। তাই সংসদে যোগদানের মাত্র দেড় বছরের মধ্যে অনুকুল পরিবেশের অভাবের অভিযোগে সংসদ থেকে স্থায়ীভাবে বার হয়ে আসে। অথচ বেতন ভাতা থেকে শুরু করে লাল পাসপোর্ট বহন ও সংসদীয় দলের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ পর্যন্ত সবরকম সুযোগ সুবিধাই গ্রহণ করে। এমন কি এক পর্যায়ে যখন দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে তাদের সদস্য পদ খারিজ হতে চলেছিল যখন তারা সেই সুযোগ সুবিধার লোভে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সংসদে হাজিরা দিয়ে আবার বেরিয়ে আসে। অথচ জনগণ তাদের নির্বাচন করেছিল তাদের আশা আকাংখার কথা সংসদে বলার জন্য এবং স্ব স্ব এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য। বিএনপির এই ব্যবহার আর যাই হোক গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচায়ক নয় মোটেই।

বারো. দেশের অর্থনীতির ব্যাপারে প্রায়শই উদ্বেগ প্রকাশে পিছপা না হলেও কার্যত দিনের পর দিন সামান্য কারণে এমনকি কখনো কখনো বিনা কারণেই দেশের সর্বস্তরের মানুষের বিরোধিতা সত্বেও তাদের ওপর জবরদস্তি মূলক হরতাল চাপিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের যে অপরিসীম ভোগান্তি ও দেশের অর্থনীতির যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে বিএনপি তাতে করে তাদেরকে জনদরদী, দেশপ্রেমিক দল হিসেবে মেনে নেয়া যায় না কিছুতেই। তাছাড়া হরতাল চলাকালীন বিএনপির কর্মীরা নিরীহ রিক্সাচালক, টেম্পোচালক, বাস কন্ডাক্টর, পথচারীদের ওপর বোমা হামলা করে, গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যেভাবে নির্মমভাবে মানুষ মেরেছে তাতে করে তাদের গণবিরোধী চরিত্রটাও খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

তের. শুধু গণবিরোধী কেন, বিএনপির দলনেত্রী নিজে নারী হয়েও সংসদের নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিলটিতে সকল মহলের অনুরোধ সত্বেও সহযোগিতা না করে, বিএনপিকে একটি নারী বিরোধী দলহিসেবেও চিহ্নিত করেছেন।

চৌদ্দ. আওয়ামী লীগের শাসনের শেষ পর্যায়ে সঙ্গত কারণে শেখ হাসিনার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বিধান করা হলে খালেদা জিয়া কালবিলম্ব না করে তার বিরোধিতা শুরু করেন। তখন তার ঘুর্নাক্ষরেও মনে থাকে না যে তার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি রাষ্ট্র ও জনগণের টাকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায়, আনুষঙ্গিক যাবতীয় সুযোগ সুবিধাসহ ক্যান্টনমেন্টের তৎকালীন সেনাপ্রধানের সুবিশাল ও সুরক্ষিত বাড়িতে তিনি বাস করে আসছেন। কপটতা ও দ্বিচারিতার এর চাইতে কোন উৎকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমান নিবন্ধকারের অন্তত জানা নেই।

পনের. সবশেষে একটি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। বছর খানেক আগে বলা নেই কয়া নেই বিএনপি নেত্রী তার সরকারি জন্মদিন পাল্টে (যা কিনা আবার তার পিতার দেয়া তারিখের চাইতে আলাদা) শেখ মুজিবের মৃত্যুদিন এবং জাতীয় শোক দিবস ১৫ই আগস্ট-কে তার জন্মদিন বলে ঘোষণা করেন এবং মহাসমারোহে ৫৫ পাউন্ডের বিশাল কেক কেটে তার পঞ্চান্নতম জন্মদিন পালন করেন, যা কোন ন্যুনতম রুচি ও বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয় কখনোই।

তো যে দলের প্রধান এমন ন্যাক্কারজনক চরিত্রের, বর্তমান নিবন্ধকারের পক্ষে আর যাকেই হোক সেই দলটিকে ভোট দেয়া সম্ভব নয় কিছুতেই। ❐

মন্ট্রিয়ল, কানাডা
১৮ই জুলাই ২০০১।

পরিচিন্তন (১০ পৃষ্ঠার পর)

বখাটেরা পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদেও উত্যক্ত করে। তারপর ক্লাস যদিও শুরু হল শিক্ষাবছর যেন শেষ হয় না। ছাত্র ধর্মঘট, শিক্ষক ধর্মঘট, কর্মচারি ধর্মঘটের উৎসব লেগেই রয়। তাই ব্যাচেলর করতেই আমরা বুড়ো হয়ে যাই।

আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ব্যাচেলর ডিগ্রীর জন্য শেষ পরিক্ষাটি দিচ্ছে পৃথিবীর অন্যদেশের একই বয়সের ছেলেমেয়েরা তখন আমেরিকায় মাষ্টার্স শেষ করে কর্মজীবনে পা দিয়ে এইচ-১ ভিসা স্ট্যাটাস পেয়ে গ্যাছে। জি. আর. ই., টোফেল আর আমেরিকান এ্যাম্বেসীর 'পুলসিরাত' পার হয়ে আমাদের সন্তানরা যখন আমেরিকায় এসে কোন স্কুলে উচ্চ শিক্ষা শুরু করলো, যীশনু দেবাঞ্জনরা তখন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্যাছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন এখানে কোন কোম্পানীতে চাকুরী শুরু করছে, যীশনু দেবাঞ্জনরা তখন ওর 'পারফর্মেন্স' রিভ্যু করে বেতন ঠিক করছে অথবা আমরা যখন পি এইচ ডি থিসিস ডিফেন্ড করছি যীশনু দেবাঞ্জনরা তখন আমাদের পি.এইচ.ডি. কমিটির মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

আমাদের প্রতিদিনের পারিবারিক ভোজন-মেনুটা খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। রান্নায় তেল ও চর্বির আধিক্যের কারণে বা পেটের মধ্যে দুবেলা লাল-মাংস প্রেরণের কারণে আমাদের বাংলাদেশীদের প্রায় সবারই কোলেস্ট্যারল লেভেল মোগল সম্রাটদের মত। সীমিত গড় আয়ুর বাংলাদেশী মানুষদের তাই হেলাচ্ছলে জীবনের শ্রেষ্ঠ তিনটি বৎসর হারানো উচিত নয়।

অযোগ্য নেতৃত্ব, অস্থির রাজনীতি আর সংস্কারহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আমাদের দেশের সোনার ছেলে মেয়েরা আমেরিকার মত দেশে এসে অন্য দেশের ছেলে মেয়েদের চেয়ে শিক্ষা দীক্ষা ও পেশায় পাঁচ বছর পিছিয়ে থাকছে । জাতিগত কোন্ দোষের কারণে বিধাতা আমাদের এমন শাস্তি দিচ্ছেন ? ❐

সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া
১৭ই জুলাই, ২০০১।

একেই কি বলে গণতন্ত্র!!

আনিসুল হক

১০দিন দেশে ছিলাম না। ইউনিসেফের উদ্যোগে গিয়েছিলাম থাইল্যান্ডে, ওখানকার এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি দেখতে এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিতে। ১৫ জুলাই ২০০১ দেশ ছেড়েছি। ১৬ জুলাই সকালে একজন কী বললেন, তিনিই জানেন, আমার কানে ঢুকলো, ঢাকায় রাজপথে সংঘর্ষে তেরোজন নিহত। মনটাই গেলো দমে। পরে জানতে পারলাম, ভুল শুনেছিলাম ভুল বুঝতে পেরে স্বস্তি হলো। কিন্তু ১০টা দিন দেশের বাইরে সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। দেশে ফিরলাম ২৪ জুলাই। ১০ দিনের কাগজ উল্টে পাল্টে দেখলাম। তারই ভিত্তিতে এই লেখা।

প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন খালেদা জিয়া। প্রধান উপদেষ্টা দায়িত্ব পেয়েই প্রশাসনে রদবদল করেছেন বড় ধরনের। উভয় দল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি-জামাত-শিবির ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ। বিভিন্ন স্থানে নেমে পড়েছে বিএনপি-জামাত কর্মীরা। তারা থানায় আক্রমণ করছে। সরকারি অফিস আদালতে চড়াও হয়েছে। ভাঙচুর করেছে বঙ্গবন্ধুর ছবি। এখন স্থানে স্থানে শুরু হয়েছে হল দখলের প্রতিযোগিতা। ছাত্রদল-শিবির কর্মীরা অস্ত্র হাতে মহড়া দিচ্ছে বিভিন্ন হলে-ক্যাম্পাসে, কোথাও সংঘর্ষ হচ্ছে ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে, কোথাও বা বিনাবাধায় ছাত্রদল দখল করে নিচ্ছে হলগুলি। কোথাও বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাহলে ব্যাপার কী দাঁড়ালো?

এরশাদ আমলে ও বিএনপি আমলে ছাত্রদলের সন্ত্রাস ক্যাডাররা দখল করে রেখেছিল ক্যাম্পাস। একটা দুটো হল শুধু ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। মাঝেমধ্যেই বেধে যেত বন্দুক যুদ্ধ। বেশির ভাগই ছাত্রদলের দুগ্রুপে, মাঝে মধ্যে ছাত্র লীগের সঙ্গে। লাশ পড়ত ক্যাম্পাসে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল পরিস্থিতি। ক্যাম্পাসগুলো চলে গেলো ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের দখল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা যা ঘটালো, তাতে নিচু হয়ে গেলো পুরো ছাত্রসমাজ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মাথা। তবে আশ্চর্য যে, মহাশক্তিধর ছাত্রদলের অবস্থা হলো লেজ-গোটানো।

এখন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল। এখন দেখা যাচ্ছে, কোথাও কোথাও ছাত্রলীগ পশ্চাদসরণ করছে, চড়াও হচ্ছে ছাত্রদল। এখন প্রশ্ন হলো, একেই কি বলে রাজনীতি? একেই কি বলে গণতন্ত্র? একেই কি বলে দেশসেবা?

গত ৫ বছরে আওয়ামীলীগের শাসনামলে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসীরা, ক্যাডাররা, দলীয় মাস্তানরা, এমপিপুত্র মন্ত্রীপুত্ররা কী করেছিল, তার দুঃসহ স্মৃতি মানুষের মনে এখনও দগদগে হয়ে আছে। সেটা বড় স্মৃতি নয়। আর ছাত্রদল বিএনপি তত্ত্বধায়ক সরকারের শুরুর দিনগুলোতেই অফিস আদালত-ক্যাম্পাস-থানায় হামলা চালিয়ে দেখিয়ে দিল, তারা কী জিনিস! আগামী নির্বাচনে তারা জয় লাভ করে, তারা কী করবে। এও বড় সুখের পূর্বাভাস নয়। এদিকে এখানে-ওখানে মাথাচাড়া দিচ্ছে জামাত-শিবির রাজাকার চক্র। শান্তিপ্রিয় সম্প্রীতিবাদী অসাম্প্রদায়িক মানুষের পক্ষে সেটাও এক মহাআতঙ্কের কথা।

এখন আমরা যাব কই? আমাদের জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ! যে কথা আগেও লিখেছি, আবার লিখতে হচ্ছে, ফুটন্ত কড়াই থেকে আমাদের যেতে হচ্ছে জ্বলন্ত চুলায়। উভয় পক্ষই নেমেছে পেশীশক্তির প্রদর্শনীতে। যেন পেশিশক্তিই তাদের ভোটে জেতাবে। জনগণের ভোট মোটেই মূল্যবান নয়। ভোটারের ভোট যেন তাদের দরকার নেই। ক্যাডারের কেরদানিই তাদের ফিরিয়ে আনবে ক্ষমতায়। আমরা ভোটাররা বড় দুর্দশার মধ্যে আছি।

এক গৃহকর্তার বাড়িতে প্রায়ই চুরি হয়। চোর কিছুতেই ধরা পড়ে না। অবশেষে একদিন দারোয়ান ধরে ফেলল চোরকে। গৃহকর্তা দারোয়ানকে বললেন, একটা লোহার রড নাও। সেটার অর্ধেকটা গরম করে লাল টকটকে করে ফেলো। দারোয়ান আদেশ অনুযায়ী কাজ করলো। গৃহকর্তা বললেন, এবার চোরের শরীরের রড ঢুকিয়ে দাও। দারোয়ান বললো, হুজুর, রডের কোন পাশটা ঢোকাব। গরম লাল পাশটা, না ঠাণ্ডা পাশটা। গৃহকর্তা বললেন, লাল পাশটা বাইরে থাকবে, অন্য সাইড ভেতরে। দারোয়ান বললো, সে কী স্যার, আমি এত কষ্ট করে রড গরম করে লাল করলাম। সেটাই যদি না ঢোকাতে পারি...। গৃহকর্তা বললেন, আরে বেয়াকুব। লাল পাশটা ভেতরে ঢোকালে ওই বেটা হাত দিয়ে রড়টা বের করে নেবে না?

আমাদের অবস্থা হয়েছে ওই চোরের মত। আমাদের শরীরে বিদ্ধ হয়ে আছে লোহার রডের একটা দিক, কিন্তু সেটা বের করতেও পারছি না, কারণ গনগনে লাল দিকটায় হাত দেব কী করে!

এদিকে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার তথা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির একমাত্র চিন্তা মনে হচ্ছে প্রশাসনে কোথায় কে বসে আছে না আছে। বিচারপতি লতিফুর রহমান দায়িত্ব নিয়েই প্রশাসনে এক দফা রদবদল ঘটান। তাতেই আঁতকে উঠেছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এখন আমার প্রশ্ন হলো, সচিবরা তো সবাই সরকারের কর্মচারীই এবং তারা যিনি যে-মন্ত্রণালয়েই থাকুন না কেন, তারা সচিবই থাকছেন। তাদের বদলি করা হচ্ছে, পদচ্যুত তো করা হচ্ছে না এবং বাইরে থেকে নতুন সচিব তো আর আনা হচ্ছে না। তাহলে তাদের বদলির সঙ্গে জনগণের ভোটের সম্পর্কটা কী এবং কোথায়? জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, তাহলে এই সচিবেরা কি তা বদলাতে পারবেন?

খালেদা জিয়ার আমলে দেশে চারটি মহানগরে মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সবাই বিএনপি সরকারের নির্দেশ মতো পদেই বহাল। এরপরেও কি মেয়র হানিফ জয় লাভ করেন নি? জনগণ দলে দলে গিয়ে হানিফের মাছ মার্কায় ভোট দিয়েছে, সরকারের কীই বা করার ছিল! এবারও যদি লোকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, সচিবালয়ের সচিবরা তা বদলাতে পারবেন বলে মনে হয় না। যদি না দেয়, তাহলে সচিবরা ভোটের ব্যবস্থা করবেন, আওয়ামী লীগ কি সেই আশা করছে? জনগণের দল আওয়ামী লীগ? আমার মনে হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি আর নিজেদের ক্রিয়াকর্ম বা জনসমর্থনের ওপরে ভরসা রাখতে পারছে না। অথবা তারা জেনে গেছে, তাদের অতীত ও বর্তমান ক্রিয়াকর্ম এমন যে জনগণের সমর্থন তারা হারিয়ে ফেলেছে। এখন জিততে হলে দরকার- না, জনগণের ভোট তারা আর আশা করে না- প্রশাসনের সহযোগিতা!

হা হতোস্মি।

জনগণ যদি ভোট না দেয়, প্রশাসনের সাধ্য নেই কাউকে জেতায়। কাজেই যে দল আবার ক্ষমতায় আসতে চায়, তার উচিত, প্রশাসনে কোথায় রদবদল হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে বার বার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপরে চাপ প্রয়োগ করে সময় ও শক্তি অপচয় না করে জনগণের দুয়ারে যাওয়া, করজোড়ে ভোট ভিক্ষা করা। জনগণ একদিনের রাজা, ভোটের দিনের। মহাক্ষমতাধর রাজনীতিকেরা একদিনের ফকির, ভোটের দিনের। জনগণকে আজ রাজার সম্মানটুকু দিতে হবে। না হলে, কারো সাধ্য নাই, এই বার এই ভোট-নদী পার করার। ❐

ঢাকা, ২৬শে জুলাই ২০০১।

প্র ব ন্ধ

হায় প্রবাসী বাঙালী

আহমদ রফিক

বাংলাদেশ থেকে একসময় দূরদেশে চলে যাওয়া সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা মানুষজন অর্থাৎ প্রবাসী বাঙালী আমাদের চোখে দূরের মানুষই রয়ে গেলেন। ওদের সোনালি ডানার মানুষ ভেবে নেয়ার কারণে কি এই আনাত্নীয় চেতনা। যেজন্য ওদের জাগতিক মানসিক সমস্যাদির দিকে আমরা কখনো ফিরে তাকাইনি, সমস্যা থাকতে পারে বলে ভাবি নি। এদিক থেকে সরকারি প্রশাসন বা আমাদের সংস্কৃতি বলয়ের মধ্যে ফারাক সামান্যই।

এ সমস্যা প্রতিবেশী দেশ ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে। তবে কিছুটা সচেতনতা ওদের কাজকর্মে ও লেখাজোকায় চোখে পড়ে। 'অনাবাসী ভারতীয়' বলে প্রচলিত ইংরেজী শব্দযুগল তার প্রমাণ। সাহিত্যের সৃষ্টিকর্মে ওদের দেখতে পাওয়া যায় সমস্যার পটভূমিতেই বিশেষ ভাবে। কেন ওরা স্বদেশে ফিরে আসলনা, এসে থাকতে পারেনা কিংবা কী তাদের সংশি-ষ্ট সমস্যা এসব নিয়েই কথকতা।

আমাদের দেশে অবস্থা ভিন্ন। প্রধানত জীবিকার টানে, কদাচিৎ অন্য কোন কারণে এক প্রজন্ম আগে যারা ঘরছাড়া হয়েছিলেন তাদের অনেকে নানা কারণে আর দেশে ফিরতে পারেন নি। সুবিধা-অসুবিধা নিয়েই স্থায়ী আস্তানা গড়ে নিয়েছিলেন ঐ সব সচ্ছল দেশে। তাদের সন্তান সন্ততিরা স্বভাবতই মানচিত্রে স্বদেশ চিনে নিতে অভ্যস্ত। অগ্রজদের তুলনায় স্বদেশের মাটি মানুষের প্রতি তাদের টান কম হতে বাধ্য তবু দু একবার স্বদেশ ঘুরে যাওয়ার পর কারো কারো মধ্যে শেকড়চেতনা লক্ষ্য করা যায়।

সত্তরের দশক থেকে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে ঐ প্রবাস যাত্রা দ্রুত পায়ে বেড়েছে। বিদেশে স্থায়ী বাসিন্দাদের সংঘাত বেড়েছে। শিকড়ের টান মাঝে মধ্যে অনুভব করেও ফিরে-আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি অনেকের পক্ষে। থেকে গেছে পাকাপাকি ভিন্ন পরিবেশে ভালোমন্দ মেনে নিয়ে, স্থানিক সমস্যা স্বীকার করে নিয়ে। যেমন ঐ স্থায়ী প্রবাসী তেমনি অস্থায়ী প্রবাসী বাঙালীদের স্বদেশযাত্রা বা স্বদেশ সংশি-ষ্ট সমস্যা নিয়ে আজকের কথা।

কথা এজন্য যে আগেই বলেছি আমরা এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন নই, সেসব দূর করার চেষ্টা তো দূরের কথা। বিশেষ করে অস্থায়ীদের সমস্যা আরো বেশী এজন্য যে তারা নিয়মিত যাতায়াত করেন। অন্যদিকে এরা দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকে এক সহায়ক শক্তি। যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা দেশে আসে এদের মাধ্যমে। পরিবর্তে হাজার রকম ঝামেলা সইতে হয় তাদের দেশে আসার সুবাদে। কিংবা দেশে এসে বা দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

ঢাকা বিমানবন্দরে এসে অর্থাৎ দেশের মাটিতে পা রাখতে না রাখতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থেকে বহু কিছুর সম্মুখীন হতে হয় তাদের। বহু ঘটনার মধ্যে ভুলে যাইনি আমরা লন্ডন-ফেরত সিলেটি ভদ্রলোকের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা, যা নিয়ে কত লেখালেখি, লন্ডন থেকে মানবাধিকার কর্মীদের আসা-যাওয়া সব মিলিয়েও কোন সুরাহা হয়নি ঘটনার। আর হয়রানির কত যে রকমফের! দেশের জন্য টাকা পাঠাবে তাতে দরকার উৎসাহী পরিসেবা-কারণ লাভটা যেমন ব্যক্তির তেমনি দেশের। তা সত্ত্বেও সে পরিসেবা যেমন যথাযথভাবে আসেনা ডাকবিভাগের মাধ্যমে, পর্যাপ্ত আসেনা ব্যাংকের ক্ষেত্রে। উৎসাহ আগ্রহের বদলে শীতলা এক অদ্ভুত স্থবির পরিবেশ তৈরি করে। ফলে বিড়ম্বনা এড়াতে কেউ কেউ ভিন্ন পথ ধরেন, কখনো তাতে অসুবিধায়ও পড়েন। এক কথায় যেখানে দেশের স্বার্থ জড়িত সেখানে পাল্টা উৎসাহ ও সেবার মানসিকতা দেশীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনার দিক থেকে মোটেই যথেষ্ট নয়। জানিনা সরকার ও প্রশাসন এসব সমস্যা নিয়ে কেন মাথা ঘামান না, গুরুত্ব দেন না গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

তেমনি দীর্ঘদিন বিদেশে বসবাসকারী কেউ যদি দেশের মাটিতে তাঁর মেধা ও মনন নিয়ে থিতু হতে চান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বলতে পারি সেখানে ঠাণ্ডাপানি ঢেলে দেয়াটাই যেন আমমদের দেশের চিরাচরিত রীতি। সমাজ ও সংস্কৃতির স্বার্থ সেখানে অনায়াসে জলাঞ্জলি দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষের দিক থেকে যেমন অনীহা কাজ করে তেমনি আরো জোরালোভাবে কখনো কখনো কাজ করে ব্যক্তিস্বার্থের সংকীর্ণতা, সমাজ ও শিক্ষার প্রয়োজন তখন দূরে সরে যায়।

একইভাবে বিদেশাগত মেধাবী কেউ যদি বিনিয়োগের সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে আসেন, চেষ্টা করেন দেশের জন্য হিতকর কিছু করতে সেক্ষেত্রেও তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার পরিবর্তে বিপরীত আচরণই প্রকট হয়ে ওঠে। এ মানসিকতার কারণ আমার কাছে আজো দুর্বোধ্য - অথচ আমরা বাঙালীরা দেশপ্রেম নিয়ে, দেশাত্মবোধ নিয়ে কত গর্ব করি, কতই না অহমবোধ প্রকাশ করি।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি একটি বিদেশী ভেষজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তি এসেছিলেন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মাটিতে একটি ঔষধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে। সেসময় অধিকাংশ ভেষজ প্রতিষ্ঠানই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক, বিদেশীদের চোখে তখন পূর্ববঙ্গের স্বাদেশিকতাভিত্তিক রাজনীতির বৈষয়িক তাৎপর্য ধরা পড়েছিল। তাই বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে তাদের ঐ প্রচেষ্টা। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম ঐ বিদেশীর সঙ্গে আলোচনায় বিনিয়োগ অধিদপ্তরের কর্তাব্যক্তিটির শীতলতা। নানা স্থানিক সমস্যা, বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনের মত বিষয়াদিও উঠে এসেছিল ঐ আলোচনায়। শেষ পর্যন্ত ওরা পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের ইচ্ছা বাতিল করে ফিরে চলে যায়। সেই স্বাদেশিকতার যুগে আমলাতন্ত্রের এসব মানসিকতা স্বাধীন দেশেও এতটুকু পাল্টায় নি। বরং তা পল-বিত হয়েছে নানামাত্রায় এমনটাই আমার

বিশ্বাস। একালে আমরা যাকে বলি মেধা পাচার- মনে হয় সেদিকেই যেন আমাদের আগ্রহ বেশী, বিশেষ করে যারা ক্ষমতার বিভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন তাদের মধ্যে অর্থাৎ আমলাতন্ত্রে এ প্রবণতা সর্বাধিক বলে মনে হয়, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাদিতে কর্মরত প্রতিবেশী দেশের পদস্থ ব্যক্তিদের আচরণ দেখেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন, তারা বিদেশী সংস্থায় কর্মরত হয়েও দেশের স্বার্থের দিকটাতে আশ্চর্য রকম আগ্রহী। এমন একাধিক উদাহরণ আমার অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরতে পারি। না, উদাহরণ দিয়ে নামধাম তুলে এনে হাটে হাড়ি ভাঙতে চাই না।

এই যদি হয় আমাদের স্বাদেশিকতার চেহারা তাহলে বলতে হয় বৈষয়িক প্রয়োজনে বিদেশে কর্মরত বাঙালীদের প্রয়োজন ও নিরাপত্তার মত বিভিন্ন দিকে সরকারি তৎপরতা নৈরাশ্যজনকই হবে, আগ্রহ সম্ভবত শূন্যের কোঠায়। বিশেষত বিদেশে কর্মরত যে বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর শ্রমিক শ্রেণী কর্মসুবাদে বা ধূর্ত আদম ব্যাপারিদের কল্যাণে নানা সমস্যায় জর্জরিত তাদের প্রতি প্রশাসনিক কর্তব্যবোধ আমাদের আছে বলে মনে হয়না। অশিক্ষা, অনভিজ্ঞতা, অন্যদের শঠতা ইত্যাদি নানা কারণে কত বাঙালী শ্রমিক বা কারিগরকর্মী বিদেশের জেলে অমানবিক জীবন যাপন করছে। আমাদের সংশি-ষ্ট বিভাগ বা অধিদপ্তর তার খোঁজ রাখেনা, তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করাতো দূরের কথা।

এ প্রসঙ্গে আমরা ন্যায়সঙ্গত কর্তব্যের কথাই বলতে চাই এবং সেদিকে সরকারের সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ে বা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বলিনা ঢাকার জেল থেকে মাদক পাচারের অভিযোগে তরুণীর মতন দণ্ডিত কাউকে বিদেশী জেল থেকে বের করে আনতে। বলি, অন্যায়ভাবে আটকদের বা অমানবিক কারণে অবরুদ্ধের প্রতি রাষ্ট্রিক কর্তব্য পালন করতে। এদিক থেকে আমাদের দূতাবাসগুলোর ভূমিকা সমালোচনারও অযোগ্য।

নৈতিক বৈষয়িক সাংস্কৃতিক কোনোদিক থেকে আমাদের দূতাবাসগুলো তাদের কর্তব্য পালন করে বলে মনে হয় না, অন্তত যথাযথভাবে করে বলে মনে হয় না। সেখানকার পদস্থ কর্মকর্তাদের ঝোঁক আখের গুছিয়ে নেবার এবং সেই সঙ্গে জমজমাট আড়ম্বরপ্রিয় জীবনযাপনের। অথচ রাজনীতি, কূটনীতি, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে দৈশিক স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থের সমৃদ্ধি ঘটানোর মত কাজই তো দূতাবাসগুলোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সেসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়না। আর হয় না বলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঈর্ষণীয় মান সত্ত্বেও তা বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে জলচল হয়ে ওঠেনি। বাংলাভাষা ও সাহিত্য তার প্রাপ্য আন্তর্জাতিক মর্যাদা তুলে ধরতে পারেনি। এদিক থেকে আমাদের দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগগুলো চরম ব্যর্থতার দায় বহন করছে। ভাগ্যিস রফিক-সালামের মত প্রবাসী বাঙালীদের ভাষাপ্রেম উথলে উঠেছিল তাই শেষ পর্যন্ত সরকারি তৎপরতায় একুশে ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ইউনেস্কোর কল্যাণে স্বীকৃতি পেয়েছে। একুশে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সবশেষে একটি কথা স্থায়ী প্রবাসীদের সন্তানদের সম্পর্কে। মিডিয়া থেকে অন্যান্য সূত্রের কল্যাণে এমন ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল যে ঢাকা এক নারকীয় নগরী- ধুলোধোঁয়া দূষিত পানি থেকে সবকিছু নিয়ে- নিতান্তই বসবাসেরও অযোগ্য। এমনটা কি পুরোপুরি ঠিক? বিদেশী মহানগরী কি স্বর্গীয় সুষমা ও শান্তির পরিবেশ নিয়ে অসামান্য। সন্ত্রাস কি অপ্রতুল? বিচারটা তুলনামূলক। তাছাড়া বিদেশ কি কখনো স্বদেশ হয়। আপন অভিজ্ঞতা কি তাদের এ সত্য জানিয়ে দিচ্ছে না যে বিদেশে তারা সত্যিকার অর্থে সামাজিক বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকতুল্য। বিশেষত মানমর্যাদার ক্ষেত্রে।

তবে একথাও সত্য যে আমাদেরও দেশটাকে সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, মানবিক করে তুলতে করণীয় অনেক কিছু আছে যা আমরা করি না। প্রয়োজনীয় সচেতনতারও অভাব। এ দায় যেমন সরকারের তেমনি সমাজের এবং ব্যক্তিরও। বিশ্বের কাছে নিজেকে তুলে ধরতে হলে জাতীয় মর্যাদাবোধেরও বড় প্রয়োজন। এ জিনিসটার অভাব আমাদের মধ্যে রয়েছে। রয়েছে সব স্তরে। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে কেন এমনটা থাকে ভেবে পাইনা।

সংস্কৃতি জগত থেকে রাজনৈতিক ভুবনে জাতীয় পরিচয় ও জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অনেক কিছু করার রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে প্রবাসী বাঙালীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে সযত্ন দৃষ্টি ফেরানো। তাদের অধিকাংশ দাবিই সঙ্গত। যেমন দেশের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার। এ বিষয়ে আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু বরফ গলেনি। এমনি একাধিক সমস্যার সমাধান না হবার দায় অবশ্য সরকারের।

আমরা আশা করবো তারা সেসব দিকে মনোযোগী হবেন মূলত রাষ্ট্রিক স্বার্থের কারণেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়গুলোতে হাত দেবেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথেষ্ট সচেতন, তৎপর ও পরিশ্রমী না হলে আন্তঃদেশীয় সমস্যার সমাধান সহজে ঘটে না। তাই আমাদের সমস্যা সমস্যাই থাকছে। এ জন্যই অনেকে মনে করেন প্রবাসী বাঙালীদের সমস্যাবলীর দিকে, তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে যথাযোগ্য নজর দিতে ঐ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই প্রবাসী অধিদপ্তর খোলা দরকার। তবে দফতর খুললেই তো হবে না- দরকার হবে সংশি-ষ্ট মানুষগুলোকে কর্মের উপলব্ধিতে চাঙ্গা করে তোলার।

ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে পরবাসী বাঙালীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, বরং অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় বেশি। নানাভাবে এদের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। তাই অন্তত আপন স্বার্থের কথা ভেবে এদিকে সতর্ক ও প্রয়োজনীয় নজর দেয়া সরকার পক্ষে অতীব প্রয়োজন। ❒

ঢাকা।

‘পড়শী’তে আপনার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন
আপনার পণ্যের খবর পৌঁছে যাবে
প্রবাসী বাঙালীর ঘরে ঘরে
বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন
www.porshi.com

পরিচিন্তন

ব্যাচেলর করতেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমরা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

মাসখানেক আগে আমাদের অফিসের সাদা-চামড়া সিস্টেম এ্যাডমিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার ভাষা বাংলা না ? বছর দুয়েক আগে ওর সাথে পরিচিত হওয়ার সময় সে আমি বাসায় কোন ভাষায় কথা বলি সেটা জানতে চেয়েছিল। সেদিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই ও আমাকে বিশ হাত দূরের অন্য একটা কিউবে নিয়ে গেল। ভারতের দুজন বাঙালী ছেলে, দেবাঞ্জন ও যীশনু; ওরা জর্জিয়া টেক-এ মাষ্টার্স শেষ করছে, সামনের সেমিষ্টারে পি এইচি ডি শুরু করবে। আমাদের কোম্পানীতে সামার ইন্টার্ন করতে এসেছে। স্বভাবসুলভ ওদের সাথে অনেক কথা বললাম। পনের মিনিটের মাথায় ওদের সাথে সম্পর্কটা বড়ভাই ছোটভাইয়ের মত হয়ে গেল, তাই ষোল মিনিটের সময় ওদের দুজনকে বাসায় এসে ডাল ভাত খেতে বললাম। পরিবারের সম্মতি না নিয়ে এ রকম হুটহাট করে পরিচিত ও অপরিচিত মানুষদের বাসায় এনে আপ্যায়ন করতে পারি একটাই ভরসায়, বাসায় একটা খাঁটি বাঙালী বউ আছে বলে।

শনিবার দুপুরে খাওয়ার আগে ও পরে আড্ডাটা ভালই জমলো। বাংলাদেশীদের যারা এসেছিল, মহিউদ্দীন, শাহীন, শহীদ এবং মূসা সবাই দেবাঞ্জন ও যীশনুকে পেয়ে আড্ডার একঘেয়েমি বিষয়গুলো ভুলে যেয়ে ভারতের বাংগালীদের অবস্থান, অনুভূতি ও অগ্রগতি নিয়েই বেশী কথা বললো। দেবাঞ্জনের বাড়ী পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায় আর যীশনুর আগরতলায়। দুজনেই খড়গপুর আই আই টি-তে পড়েছে। বর্ধমান ও আগরতলা এই দুটো জায়গা বাংলাদেশী বাঙালীদের খুবই সুপরিচিত। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে আমাদের বিদ্রোহী কবি জন্মগ্রহণ করেছিল আর আগরতলার ষড়যন্ত্রতো আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। তাই ভাষাগত কারণ ছাড়াও দেবাঞ্জন ও যীশনু বর্ধমান ও আগরতলার ছেলে হওয়ার কারণে সবার সাথে বেশ তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। আলাপচারিতায় জানা গেল ওরা দুজনে ঊনিশশো ছিয়ানব্বই-এ ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। ছিয়ানব্বই-এ এইচ এস সি পাশ করে দু' হাজার একে মাষ্টার্স শেষ। আমরা বাংলাদেশীরা এই সত্যটার কাছে অপরিচিত নই। কর্মক্ষেত্রে তাই অনেক কম বয়েসী বস্‌দের বস্‌গিরির ও খবরদারির নিরব সাক্ষী আমরা। আমেরিকার মত উন্নত দেশের মানুষেরা যারা শিশুকাল থেকেই ভাল খায়-পড়ে, বিজ্ঞান সম্মত কায়দায় নিজ নিজ জ্ঞান ও ধ্যান-চর্চা-অনুকুল পরিবেশে বেড়ে ওঠে, প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী অর্জনে ভিটামিন-ডি যুক্ত দুধ খাওয়া বালক বালিকারা আমাদের সাভারের ভেজাল মিল্কভিটা খাওয়া বা একেবারেই দুধ-চোখে-না-দেখা ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে এক ধাপএগিয়ে থাকবে এটাইতো স্বাভবিক। কিন্ত আমাদের পাশের দেশের ছেলেমেয়েরা যারা 'অর্ধেকটা ডিমের পুরোটা ' খেয়ে বড় হচ্ছে তারা বিদ্যা অর্জনে উন্নত বিশ্বের এই গতিটা পেল কোথা থেকে!

দুদিন আগে 'সলিড স্টেট সার্কিট্‌স' আটানব্বই-এর একটা সংখ্যায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। 'সলিড স্টেট সার্কিট্‌স' জার্ণালটি ইনস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্সের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত অন্যতম একটি গবেষণাধর্মী মাসিক মুখপত্র। প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর শেষে ছাপা লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলোতে চোখ গেল।

চার্ল্‌স সোডিনি পেনসিলভেনিয়ায় বায়ান্নোতে জন্ম। একাশি সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলী থেকে পি.এইচ.ডি করেছে। বায়ান্ন সালে জন্ম নিয়ে চার্ল্‌স চুয়াত্তরে অর্থাৎ বাইশ বৎসর বয়সে ব্যাচেলর ডিগ্রী শেষ করে। অন্য একটি নিবন্ধের লেখক বেলজিয়ামে জন্ম গ্রহণকারী উইলি স্যানসেন, তেতালি-শ সালে যার জন্ম, বাইশ বৎসর বয়সে ঠিক পয়ষট্টিতে ব্যাচেলর ডিগ্রী অর্জন করে। লেখক প্রফেসর স্যানসেনও ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, বার্কলী থেকে পি.এইচ.ডি অর্জন করে। আমেরিকার সোডিনি আর বেলজিয়ামের স্যানসেনের জীবনী পড়ে যেটা বুঝলাম সেটা হল ব্যাচেলর ডিগ্রীর জন্য বাইশটা বৎসর বেঁধে দেয়া ধনী দেশগুলোর সিস্টেম। সময়ের কাজ সময়ে করার জন্য হয়তো এই সিস্টেমটা আমাদেরও চালু করা উচিত।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের জন্য সময়সীমা, অন্ততঃ ব্যাচেলর পর্যন্ত, বিশ্বের প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশেও বেঁধে দেয়া আছে। তাই একই সংখ্যার ইরানে জন্মগ্রহণকারী লেখক হামিদ রাতেঘ বাহাত্তরে জন্মগ্রহণ করে চুরানব্বইতে, পাকিস্তানের মোহাম্মদ ইউনুস তেপ্পান্নতে জন্মগ্রহণ করে পঁচাত্তরে ব্যাচেলর ডিগ্রী শেষ করেছে। পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশীরা চৌষট্টিতে যাদের জন্ম তারা চব্বিশ বৎসর বয়সে অষ্টাশিতে অথবা আটষট্টির ছেলেমেয়েরা পঁচিশ বৎসর বয়সে তেরানব্বই সালে ব্যাচেলর ডিগ্রী শেষ করেছে; তাও বোধহয় ম্যাট্রিকে রেজিষ্ট্রেশনের সময় এক বৎসরের মত বয়স চুরি করে। এইচ.এস.সি. পর্যন্ত শেষ করতে পরীক্ষার আগে জন্ডিস না হলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও কিন্ত আঠারো বছরের বেশী সময় নেয় না। তারপর নিজের কোর্টের বল চলে যায় রাজনীতিবিদ আর যুগের সাথে তাল ও মাত্রাহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কোর্টে।

আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট বের হতে সময় লাগে তিন মাস, ভারতেও লাগে তিন মাস। তারপর ছয় মাস থেকে এক বৎসর দেয়া হয় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে। ভর্তি যদিও হলাম, ক্লাস শুরু হবে আরও এক বৎসর পর। তেজদীপ্ত তরুণ ও তরুণীদের জীবন থেকে প্রায় দেড়টা বৎসর কেড়ে নেয়া হয়। 'আইডেল ব্রেন'-এর বসে থাকা এই সময়টুকু অলস ছেলে মেয়েরা কাটায় আংগুল চুষে, বৈষয়িকরা টিউশনি করে আর

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কালান্তরের কাল

আরো একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার

মাহমুদুল হোসেন

বাংলাদেশে এখন কালান্তরের কাল। একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার তার পাঁচ বছরের মেয়াদকাল পূর্ণ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে না স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাংবিধানিক বিধি কার্যকর হয়ে নতুন সরকার স্থাপিত হয়েছে সে বালখিল্য সুলভ বিতর্কে আর জড়াচ্ছি না নিজেকে। ঘটনা এই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। এই কালান্তর মসৃণ হবে কিনা, কোনো ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে কিনা অথবা ষড়যন্ত্রের আশংকার সুযোগ নিয়ে কেউ স্বেচ্ছাচারের বিস্তার ঘটাবে কিনা - এসব নিয়ে আমরা বড়ই বিচলিত ছিলাম। আমাদের আস্থা কমেছে সকলের ওপরে - তার মধ্যে আমরা প্রত্যেকে আছি, আছে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান, আমাদের সকল সংগঠন। কিন্তু এই সাফল্যের কালে আর কুডাক ডাকবো না - বরং এই বেলা অভিনন্দিত করে ফেলি নিজেকে আর নিজেদের সকলকে। আমরা সকল ঋণাত্মক প্রক্রিয়াকে এড়াতে পেরেছি, যা কাঙ্খিত আমাদের এবং আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী এবং অভিভাবকের তা অর্জন করতে পেরেছি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা এবং এর বাস্তবায়ন বিষয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। এই সাফল্যের দাবিদার আমরা সকলে। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে এই আইনটি সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছিল; সে সংসদে আবার জাতীয়তাবাদী দল ছাড়া আর কোনো নাম বলার মত দল ছিল না। ভোটার বিহীন এক অভূতপূর্ব নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি সংসদে লাভ করেছিল তিন চতুর্থাংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর সেই বলে সংবিধান পরিবর্তন করে উপহার দিয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অন্যদিকে সে সময়কার প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ রাজপথে অনমনীয়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের দাবি তুলেছিল এবং তারা দাবি করতেই পারে যে তাদের সেই অরাজক গণতন্ত্র চর্চ্চার ফলশ্রুতিতেই আমরা লাভ করেছি এই সুশাসন ব্যবস্থা। আর জামাতে ইসলামীতো নামকরণের কৃতিত্বই দাবি করে বসবে - তারাই প্রথমে বলেছিল, ইংরেজিতে অবশ্য, “তত্ত্বাবধায়ক” শব্দটি; তার আগে “অন্তর্বর্তী”-ই বেশি প্রচলিত ছিল যেন বা। বাম রাজনীতির ধারকদের কোনো উচ্চারণে মনে হয়নি তারা এই ধারণার বিপক্ষে বরং এরূপ সরকারের সাথে সহযোগিতা করা এবং এই ধারণার মূল চেতনাকে সংরক্ষণে তাদের যে মনোযোগ তা লক্ষ্যণীয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ আমাদের এক জাতীয় আকাঙ্খা যে আমরা প্রতি পাঁচ বছরে একবার অনির্বাচিত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে চলে যাব, তারাই সফলভাবে উপহার দিতে পারবে আমাদের নির্বাচিত সরকার।

বলছিলাম আমরা গর্বিত বিষয়টি নিয়ে; এ কারণেই সম্ভবত যে এ এক অনন্য ব্যাপার পৃথিবীর মানুষের গণতন্ত্র চর্চ্চায়। আর কোনো গণতন্ত্রের তত্ত্বাবধান দরকার হয় না প্রতি পাঁচ বছরে একবার। আমি যেমন পেশাদার সাংবাদিক নই, তেমনি সংবিধান বিশেষজ্ঞও নই। তবে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি নিউজিল্যান্ডে অন্তর্বর্তী সরকারের একটি ধারণা রয়েছে, তবে সেটি অনির্বাচিত কোনো ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়না, নির্বাচিত সরকারই রূপ বদলে অন্তর্বর্তী হয়ে পড়ে, সংবিধানের ধারা বলে তার ম্যান্ডেট বদলে যায়। সম্ভবত, এই ধারণা সত্যই যে, আমরাই এইরূপ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভাবক এবং এ যদি গর্বের ব্যাপার হয় তাহলে গর্ব আমরা করতেই পারি।

দেখা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশার কোনো শেষ নেই। কারো কারো জন্য এ এক উৎসবের মত ব্যাপার যেন বা। এক ইংরেজি পত্রিকাতো প্রথম পাতায় রঙীন হরফে দিন গোনার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিল। সকলের আশা এ সময়ে দেশে সুদিন আসবে, দেশের সব সন্ত্রাস বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হবে, বানিজ্যের সব অনিয়ম দূর হবে, আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যিকারের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মানবাধিকার যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। এ এক স্বর্গরাজ্যের আকাঙ্খা আমাদের, এমন সুশাসন আর আইনের আওতায়তো থাকি না আমরা! ভেবে দেখার মত বিষয় এই যে, নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশ তবে কিভাবে চলে। ২০০১ সালে ঘোর আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাড়া আর সবাই স্বীকার করবেন যে, সন্ত্রাস পৌঁছেছে এক অবিশ্বাস্য মাত্রায়। নিরাপত্তাহীনতা প্রায় জাতীয় ব্যাধিতে পরিণত হতে চলেছে। ১৯৯৬ তে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা আমাদের দিয়েছিল আরেক রকম নিরাপত্তহীনতা যাকে বলা যায় সরকারি সিদ্ধান্তহীনতাজাত এক অনিশ্চিত অবস্থা। এমনি দুঃসময়গুলো কাটিয়ে উঠতে আমরা প্রহর গুনি তত্ত্বাবধায়কের আগমনের। এ আকাঙ্খা কত মরিয়া হয়ে উঠতে পারে তার একটা উদাহরণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে বোঝা গেল। একজন আইন পেশাজীবী পত্রিকায় একটি নিবন্ধে এই সরকারের কাছে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবি তুলেছেন। তার সুর মরিয়া এবং করুণ। তিনি বলছেন একথা আর বিশ্বাসযোগ্য নেই যে কোনো নির্বাচিত সরকার (তিনি বারবার “দলীয় সরকার” কথাটি ব্যবহার করেছেন) বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কাজটি সমাধা করবেন; কারণ বিচার বিভাগ তথা বিচারকদের হাতে রাখতে পারলে কী করা যায় তা সবাই বুঝে গেছে! অতএব এ কাজটি একমাত্র নির্দলীয় নিরপেক্ষ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই সমাধা করা সম্ভব। তিনি এই পেশার লোক এবং এর সাথে সংশি-ষ্ট কাজের ব্যাপকতা এবং জটিলতা জানেন এবং তা বিশদ লিখেছেন। তাও তিনি আশা করছেন এই তিন মাসের সরকার, যার মূল কাজ একটি যথাযথ নির্বাচন সম্পন্ন করা, সেই সরকার এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞে হাত দেবেন। তাঁকে মরিয়া বলছি এ কারণে যে, তিনি সংবিধানের বিভিন্ন ধারা উদ্ধৃত করে একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন যে, এ কাজটি কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া নয় বিধায় তা অনায়াসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সম্পাদন যোগ্য। তিনি মনে রাখতে চাইছেন না যে এ কেবল সাংবিধানিক ক্ষমতার ব্যাপার নয়, একটি ব্যাপক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মৌলিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে চালু করার নৈতিক ভিত্তি এবং কার্যদক্ষতা বর্তমান থাকার ব্যাপারও বটে। আমি আইনজীবী ভদ্রলোকের সাধু উদ্দেশ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছি না কেবল আমাদের মরিয়া অবস্থা আর নির্বাচিত সরকার বিষয়ে আমাদের আস্থাহীনতার মাত্রাটি তুলে ধরতে চাইছি।

একটি কৌতুক মনে পড়ছে প্রায় দেড় দশক আগের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তখন বাম রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষে - অপ্রত্যক্ষে কিছু সম্পর্ক ছিল। আমাদের এক বাম রাজনৈতিক কর্মীর সাথে আমাদের বাড়িতে আমার এক ভগ্নিপতির পরিচয় হয়। আমার ভগ্নিপতি সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাবাহিনীর কর্মদক্ষতা, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের জ্ঞানদান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, দেশ পরিচালনায়, অতএব, সেনাবাহিনীই উত্তম। আমাদের বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো, তার চেয়ে উত্তমতর সমাধান হচ্ছে কতিপয় বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দেশটি ইজারা দিয়ে দেয়া। এতে করে সুশাসনের সাথে মুনাফাও পাওয়া যাবে, কারণ তাদের দক্ষতাতো প্রশ্নাতীত, উপরন্তু তারা মুনাফা অর্জনে সিদ্ধহস্ত ! আমাদের খোশগল্পের সে আসরটি অতঃপর যে চেহারা নিয়েছিল সে বিষয়ে আর এখানে আলোকপাত করছি না। আমাকে সহৃদয় পাঠক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে এরকম হালকা কৌতুকের অবতারণা করার জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে যেরকম জাতিগত উত্তেজনার ভেতর আমরা রয়েছি তাতে কেন জানি কৌতুকটি খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো না।

আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতার আসনে বসে পড়েছেন। আমরা এই নিবন্ধ রচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দেড় সপ্তাহকাল এই সরকারের আমলে অতিবাহিত করেছি। এ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল যে, আমরা ঠিক তিন মাস সময়সীমার ভেতরই একটি জাতীয় নির্বাচন পেয়ে যাবো। এই নির্বাচন বাংলাদেশের সম্ভাব্য বাস্তবতার মধ্যে একটি ভাল-মন্দ মেশানো নির্বাচন হবে এও আশা করা যায়। নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ নানা আপত্তি তুলবেন, সে আপত্তি নির্বাচনের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা পর্যন্ত চলে যেতে পারে। আসলে এটা পুরোপুরি নির্ভর করে কার কী আশা আর সে আশা কতটা বাস্তব-নির্ভর তার ওপর। তত্ত্বধায়ক সরকার অনেক ধরনের সংস্কার কর্মসূচি নেবেন যা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে বলে মনে করা হয়। এখানে একটা প্যারাডক্স আছে বলে মনে করি। এই গ্রহণযোগ্যতা কার কাছে? আমাদের নির্বাচনকে একটা উঁচু মানের সার্কাস মনে করে তা পর্যবেক্ষণের জন্য যারা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তাদের কাছে? আমার বিশ্বাস তারা যেসব বিদেশী প্রভুদের চাকুরি করেন তারা আমাদের মত দেশে গণতন্ত্রের ধার ধারেন না, তাদের প্রয়োজন স্থিতিশীলতা। সেটা ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো, চিলির পিনোশে কিংবা পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফ দিতে পারলেও অসুবিধা নেই। স্থিতিশীলতা প্রয়োজন কমিউনিজম বা মোল-াতন্ত্র মোকাবেলার জন্য, প্রয়োজন কফি, তেল, গ্যাস এসব ক্ষেত্রে লাভজনক বিনিয়োগের জন্য। বিদেশীদের বাদ দিলে আর থাকছে আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলো। তাদের সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন মানে নিজে বিজয়ী হয়েছি এমন নির্বাচন। স্মরণ করুন, ১৯৯১ এ নির্বাচনের ফলাফল সবে আসতে শুরু করেছে সেই সন্ধ্যাবেলা বেগম জিয়া নির্বাচন কমিশনে হাজির হয়ে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন, পরে দেখা গেল তিনি জিতে গেছেন! শেখ হাসিনা হেরে গিয়ে বললেন সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। ১৯৯৬ তে বিএনপিকে নির্বাচনের ফল মেনে নিয়ে সংসদে বসতে রাজি করাতে অনেকের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন হয়েছে। দুটি নির্বাচনই কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার কথায় যদি নৈরাজ্যের গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলি যেকোনো ধরণের নির্বাচন বহির্ভূত শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে আমার সন্দেহ এবং এলার্জি রয়েছে। আমার এরকম একটি উচ্চারণের আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। নিজেদের দেশ ছেড়ে পাকিস্তান নামক সামরিক স্বৈরশাসনে আগপাশতলা নিমজ্জিত দেশটির দিকে চোখ ফেরাই। সেনাবাহিনী দেশটির ৫৪ বছর বয়সের মধ্যে অন্তত আধাআধি সময় শাসন করেছে। তারা প্রতিবারই আবির্ভূত হচ্ছে অদক্ষ, অসাধু নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে জনগণকে আর দেশকে রক্ষা করার সাধু সংকল্প নিয়ে। পরিস্থিতি এমন যে, সে দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠারই কোনো সময় পাচ্ছে না। বেশির ভাগ সময় গণতন্ত্রের চর্চা নেই, পরমত সহিষ্ণুতার কোনো প্রশিক্ষণ নেই। ফলে এক দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি হচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর থাকছে না বলে গণতন্ত্র পরিপক্ক হয়ে উঠছে না আর অপরিপক্কতা বা ব্যর্থতার অভিযোগে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বারবার অকার্যকর করে দেয়া হচ্ছে। এখন পাকিস্তানে এমন অবস্থা যে সামরিক সরকার ক্ষমতায় এলে দেশের সুশীল সমাজ তাকে স্বাগত জানিয়ে বসে থাকে। গণতন্ত্রের দুঃশাসন থেকে মুক্তির এ এক মরিয়া কামনা যেন। আমরা কি লক্ষ্য করবো যে, এ প্রায় আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য অপেক্ষার মতই! আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলা যেতে পারে যে, সামরিক বাহিনী সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল করে আর আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হচ্ছে সংবিধানে সন্নিবেশিত জাতীয় আকাঙ্খার ফসল। আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই সংবিধানে বহুভাবেই বহু কিছু লিখে ফেলা যায়, আর তা লেখা মাত্রই জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে সামরিক সরকারগুলো নিজেদের অপকর্ম জায়েজ করার জন্য সংবিধানে বিস্তর কাটাছেঁড়া করে থাকে; সেগুলোর বৈধতা কোনো না কোনোভাবে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারই প্রদান করে থাকে। এই সব বিধি আর যা-ই হোক জনগণের আশার সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়। কাজেই একথাও সম্ভবত সত্য নয় যে জনগণ প্রতি পাঁচ বছরে একবার তিন মাসের জন্য কিছু অনির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে। যদি কোনো জরীপ বা সমীক্ষা তেমন কিছু প্রতীয়মান করে তাহলে সে হচ্ছে তেমনি মরিয়া এক মানসিকতার প্রতিফলন যা পাকিস্তানের মত দেশে সামরিক শাসনকেই স্বাগত জানাবার

মতই ব্যাপার। কিন্তু সেই মানসিকতার কাছে আমরা যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছি তাতে গ-নি বোধ না করার কোনো কারণ আছে কী? সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধার যারা সেই রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের এই দীনতা গর্বের সাথে প্রকাশ করছে! তারা জানাচ্ছে যে, আমাদের দক্ষতা এবং পরিপক্কতা এখনও বালকোচিত পর্যায়ে রয়েছে। তাই আমাদের ওপর আপনারা যতখানি আস্থা রাখতে চাইছেন ততখানি আস্থার যোগ্য আমরা নই, বিশেষ করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন রয়েছে। এ পরিহাসের কথা হতে পারে, কিন্তু বড়ই করুণ সে পরিহাস, বিশেষত আমাদের গণতন্ত্রের জন্য।

অভিভাবকদের নিয়ে সমস্যা নানাবিধ। প্রথমত, তাদের মধ্যে উচ্চমন্যতা সৃষ্টি হবার অপার সুযোগ। কেনই বা তা হবে না? যার শাসন করবার কথা সে পারছে না বলে কতিপয় ব্যক্তি অভিভাবকের ভূমিকায় আবির্ভূত হচ্ছেন। তারা যে উচ্চ প্রকৃতির তাতো এ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। এই উচ্চমন্যতা দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের জন্য বিপদজনক হতে পারে, সমাজের একটি গোষ্ঠী নিজেদের যোগ্যতা বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্তে আসতে পারে, অনভিপ্রেত উচ্চাভিলাসের সৃষ্টি হতে পারে তাদের মনে। অতীতে ঝুট ঝামেলা সৃষ্টি করেছে এমন শক্তির সাথে অসাধু ঐক্যে তারা আমাদের নড়বড়ে গণতন্ত্রের গোড়া ধরে টান দিতে পারে। এর সাথে যুক্ত হতে পারে স্বেচ্ছাচারিতা। সংবিধানের বিধান যতই সুস্পষ্ট হোক না কেন, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" - এই আপ্তবাক্য যখন সাময়িকভাবে স্থগিত তখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়া অসম্ভব কী? বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন মাননীয় উপদেষ্টা মাত্র সেদিন এক টেলিভিশন চ্যানেলকে বিভিন্ন দাবিদাওয়া সর্ম্পকে যে ভাষায় কথা বললেন তাতে আমার এই আশংকা অমূলক বলে মনে হলো না। তিনি ভুলেই যাচ্ছেন রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত প্রকাশিত হবার একটি বাতাবরণ। তাছাড়া রয়েছে সংবাদপত্র, যা জনমত প্রকাশিত হবার সবচেয়ে শক্তিমান মাধ্যম। কিন্তু তার বক্তব্য হচ্ছে কে কী বলছে তাতে তার কিছুই আসে যায় না। তারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। প্রিয় পাঠক, মনে হয় কী এরকম সুরে কথা আমরা আগেও শুনেছি, একাধিক বার! অভিভাবকদের বিষয়ে আমার আরেক সমস্যা হচ্ছে "নিরপেক্ষ" শব্দটি নিয়ে। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গড়ছি একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আর তার সাথে কজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা, আইনজীবী, ব্যবসায়ী এরকম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। তাদের যে পরিচয়টি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই যে তারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ। এর মানে কি তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তারা কি এমন কিছু মানুষ যাদের কোনো রাজনৈতিক মতামত নেই? তা হলে আমি তাদের ব্যাপারে একেবারেই স্বস্তি বোধ করবো না। স্বীয় পেশায় দক্ষ এই মান্য জনেরা যদি অরাজনৈতিক প্রাণী হন তাহলে তাদের নাক উঁচু এবং আত্মকেন্দ্রিক হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখি। এরকম মানুষেরা দেশ চালালে আমাদের অবস্থা এককালের "ব-াডি নেটিভ"দের মত হয়ে যেতে পারে! অন্যদিকে আমরা যদি মনে করি তারা এমন মানুষ যাদের রাজনৈতিক মতামত রয়েছে, তবে তারা তার উর্ধ্বে থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম তাহলে ব্যাপারটি কী এমন দাঁড়াচ্ছে না যে, যে চরিত্রের দৃঢ়তা আমাদের রাজনীতিবিদদের নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করছি? আমার জানতে ইচ্ছে করে কিছু বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি সম্পর্কে কীভাবে এই নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। প্রজাতন্ত্রের জনগণ কার বিচারের ওপর নির্ভর করে এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত হতে বাধ্য হবে?

এক পত্রিকায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা নিয়ে। তারা বলছেন যদি স্বাধীনতা বিরোধীরা দাবি তোলে যে, দেশের ইতিহাস বিকৃতি রোধসহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নানা কার্যক্রম যা বিগত সরকার চালু করেছে তা বাতিল করতে হবে, কারণ তা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কর্মসূচি, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী করবেন। আসলে তত্ত্বাবধানে সমস্যা অনেক এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল স্পিরিটের সাথে অসামঞ্জস্য। কিন্তু আমরাতো আমাদের জন্য অন্য কোনো উপায় খোলা রাখিনি। অতএব তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়েই আমাদের কালান্তর হবে, আপাতত, আমাদের সাবালক হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত। ❑

ঢাকা,

২৫শে জুলাই, ২০০১।

নতুন প্রজন্মের জন্য বিশেষ বিভাগ
'ছোট্টমনিদের পাতা'

পাঠকদের মতামতের উপর ভিত্তি করে নতুন প্রজন্মের জন্য 'পড়শী'র একটি বিভাগ চালু হলো এ সংখ্যা থেকে

এ বিভাগে প্রকাশিত হবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ছড়া, কবিতা, রচনা, ড্রইং, আর্ট (সাদা-কালো) ইত্যাদি

এ বিভাগটির মাধ্যম হবে মূলত: ইংরেজী

ছোট্টমনিদের লেখা প্রকাশের জন্য অতিসত্ত্বর আমাদের কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হচ্ছে

লেখা ছাড়াও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সংবাদ (ছবিসহ) পাঠাতে পারেন

লেখা ও সংবাদ মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে

লেখা ই-মেইল, ডাক অথবা ফ্যাক্স যোগে পাঠাতে পারেন

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড

সাইফুল-াহ মাহমুদ দুলাল

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্ন ছিল একটি নতুন দেশ গড়ে উঠবে। দেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। কিন্তু তা হয়নি। হয়েছে তার বিপরীত। বার বার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে দেশ। দেশ গড়ার স্বপ্ন হয়েছে ধুলিসাৎ। আক্রান্ত হয়েছে স্বাধীনতা, সংবিধান, গণতন্ত্র। বিপন্ন স্বাধীনতা আর বিধ্বস্ত গণতন্ত্রের উপর চেপে বসেছে কখনো সামরিক শাসন কিংবা স্বৈরশাসন অথবা অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ। যা আমাদের ত্রিশ বছরের স্বাধীন রাষ্ট্রকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এদেশ আজ যেন জীর্ণশীর্ণ পুস্টিহীন যুবক।

মাও সেতুং বলেছিলেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি, আর রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ।' ... বাংলাদেশের অসংখ্য লোমহর্ষক ও চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।'

যেখানে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবার কথা - সেখানে বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে। ত্রিশ বছরের সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই বেশী। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সভ্যতা, সাংস্কৃতিক সবদিক দিয়েই এদেশ মোটেও অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। এই না পারার পেছনে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। কারণ একের পর এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলো দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উপর দারুণভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। ফলে আমাদের উন্নতি-উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

"এক যুগল নারী ও পুরুষ থেকে মানুষের সৃষ্টি হলেও মানুষ হাবিল-কাবিলের যুগ থেকে হিংসা, দ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার গোলামি করছে। মানুষের ইতিহাসে যে অসহিষ্ণুতার দিকটা রয়েছে তা হঠাৎ করে উবে যাবে না। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এদে আমরা দেখছি নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতায় আমরা তথাকথিত বর্বরদের চেয়ে কিছু কম যাই না।"[২]

একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেও বর্বরতা কমেনি। বছর আগে হত্যা করা হলো মুক্তযোদ্ধা কাজী আরিফ আহমেদকে, বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলো সাধারণ মানুষ উদীচী সম্মেলনে, কমিউনিস্ট পার্টির জনসভায়, রমনা বটমূলে, নারায়ণগঞ্জ আ'লীগ অফিসে।

কেনো এই সব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড? এ প্রশ্ন যত সহজ তার উত্তর মোটেও সহজসাধ্য নয়। হাজার বছরের বাংলা এবং বাঙালীর মূল উত্থান অথবা ঠিকানা শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সাল থেকে। জাতীয় সেই উত্থানকে নির্মুল করার জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৩৮২ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কতিপয় উচ্চাভিলাষী সৈনিক রাতের আঁধারে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে। স্বাধীনতার স্থপতির রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলাদেশের মাটি। তারপর তাঁর চার সহকর্মী জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানকেও ৩ নভেম্বর '৭৫-এ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় জেলখানার অভ্যন্তরে। ৬ নভেম্বর '৭৫-এ প্রতিবিপ-বে নিঃশেষ হন খালেদ মোশাররফ।

২১ জুলাই '৭৬-এ বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকেও প্রাণ দিতে হলো ফাঁসির মঞ্চে। জেনারেল জিয়াকেও ১৯৮১ সালের ৩০ মে হত্যা করা হলো চট্টগ্রামে সার্কিট হাউজে। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১ জুন ১৯৮৩-এ প্রাণ হারালেন মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল মঞ্জুর। ২৩ সেপ্টেম্বর '৮১-এর মধ্যরাতে জিয়া হত্যার বিচারের নামে প্রহসনমূলক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় আরো ১২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।[৩]

বাংলাদেশের উলে-খযোগ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে যারা নির্মম শিকার হন তাদের মধ্যে শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, তাজউদ্দিন, রউফ, সেরনিয়াবাত, শেখ মনি, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল তাহের, জেনারেল জিয়া, জেনারেল মঞ্জুর অন্যতম। বিস্ময়ের ব্যাপার, এরা সকলেই বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালীর জয় হয়েছে, কিন্তু পরাজয় হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের।[৪]

আমরা এই সব হত্যাকাণ্ডের সাথে স্মরণ করতে পারি - সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, আসাদ, মতিউর, সার্জেন্ট জহুরুল, ড. জোহা, সেলিম, দেলোয়ার, নূর হোসেন প্রমুখ। এখানে বিতর্কিত সিরাজ সিকদার-এর বিষয়টিও এসে যায়।[৫] এদের রক্তেই রাঙা হয়ে আছে বাংলার মাটি। অথচ স্বাধীনতাবিরোধী কোনো একটি রাজাকার-আলবদরকে রক্ত দিতে হয়নি। ভাগ্যের এমনি পরিহাস মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মুসলিম লীগার শাহ্ আজিজ হয়েছে এদেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজাকার আবদুর রহমান বিশ্বাস হয়েছে রাষ্ট্রপতি, হুমায়ুন খান পন্নী হয়েছে ডেপুটি স্পিকার, মওলানা মান্নান হয়েছে মন্ত্রী। এদের গাড়িতে উঠেছে জাতীয় পতাকা। শুধু গদ্যে নয়, পদ্যেও প্রতিবাদ করেছেন কবিরা। 'অথচ আশ্চর্য সময়/ব্যথিত পতাকা উড়ে দেশদ্রোহী খুনীর গাড়িতে।[৬]

কুখ্যাত গোলাম আজম অর্জন করেছে হারানো নাগরিকত্ব। হত্যাকারীরা পেয়েছে রাষ্ট্রিয় পদ ও পুরস্কার। আর মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহী। পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরাই লাভবান হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে দেশ। রক্তাক্ত হয়েছে বাংলার ইতিহাস।

তাই ফরহাদ মাজহারের ভাষ্য : "বাংলাদেশের ইতিহাস রক্তে ভেজা। দেশ হিসাবে জন্ম লাভের নয় মাসের মধ্যে রক্তপাতই শুধু নয়, রাষ্ট্র হিসাবে তার পত্তন এবং ভাঙাগড়ার ঘটনা প্রবাহ রক্তপাতে নদীপার লাশে গোরস্থান হয়েছে অনেকবারই। শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা সেই ইতিহাসের খণ্ডাংশ মাত্র, পুরোটা নয়। সেই খণ্ডাংশেরও দৃশ্য ও অদৃশ্য দিক আছে। অপরদিকে দৃশ্যে সংঘটিত ঘটনাপঘটনেরও প্রকাশ্য

ও অপ্রকাশ্য নায়ক রয়েছে।"[৭]

বর্তমান সভ্যতার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে - আইন অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থা। বিচার ব্যবস্থা আধুনিক সভ্যতার এক অপরিহার্য বিষয়। বলতে গেলে আধুনিক সভ্যতার প্রথম ও প্রধান শর্তই হচ্ছে সুষ্ঠু, স্বাধীন ও সত্যিকারের সুশৃঙ্খল প্রাতিষ্ঠানিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা। তাই - মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। কিন্তু কখনো কখনো বাংলাদেশে তার বিপরীত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড/ আশরাফ কায়সার, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, ঢাকা। পৃষ্ঠা- ১৬৩। এই গ্রন্থে লেখক দেশের হাজার হাজার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

২. আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা/ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা। পৃষ্ঠা - ৩১

৩. ফাঁসি প্রাপ্ত সৈনিকেরা হচ্ছেন, ব্রিগেডিয়ার মহসীন উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম, কর্ণেল নওয়াজেশ উদ্দিন, কর্ণেল আবদুর রশীদ বীর প্রতীক, লে. কর্ণেল এ. ওয়াই.এম মাহফুজুর রহমান বী. বি. বার, লেঃ কর্ণেল দেলাওয়ার হোসেন বীর প্রতীক, মেজর এজেডএম গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মেজর রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া বীরপ্রতীক, মেজর কাজী মমিনুল হক, মেজর মজিবর রহমান, ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার, ক্যাপ্টেন জামিল হক, লে. রফিকুল হাসান খান এবং লেঃ কর্ণেল শাহ মোঃ ফজলে হোসেন। শেষোক্ত ব্যক্তিকে অসুস্থতার জন্য পরে অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর ১৯৮৩ সালে ফাঁসি দেয়া হয়। আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য আনোয়ার কবিরের 'ফাঁসির মঞ্চে ১৩ জন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪. ভোরের কাগজ, ৬ জানুয়ারি, ১৯৯৯, ঢাকা।

৫. পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি নামের এই চরমপন্থী দলের নেতা সিরাজ সিকদারের মৃত্যু (২ জানুয়ারি '৭৫) নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যদি 'হত্যাকাণ্ড' প্রমাণিত হয়, তবে এটিই স্বাধীন দেশের প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলে অনেকেই মনে করেন।

৬. অব্যর্থ আঙুল/ আবু হাসান শাহরিয়ার। গন্তব্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, ঢাকা। পৃষ্ঠা - ২৯।

৭. পাক্ষিক চিন্তা, ৩০ নভেম্বর ১৯৯৮, ঢাকা। পৃষ্ঠা- ৯ । ❐

ঢাকা,

২৫শে জুলাই, ২০০১।

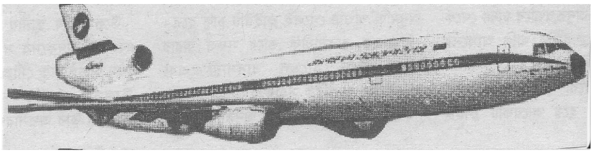

ক্যানাডায় বসবাসরত

বাঙালীদের জন্য সুখবর!!

ক্যানাডা এবং আমেরিকার যে কোন শহর থেকে ইউরোপের লন্ডন, প্যারিস, ফ্র্যাংফোর্ট কিংবা রোম হয়ে বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা, কোলকাতা ও সিলেটের টিকিট আমরা ইস্যু করে থাকি। নিউইয়র্ক থেকে ঢাকা বা সিলেটের মতন ভাড়ায় আপনি মন্ট্রিয়ল কিংবা টরন্টো থেকে ঢাকা অথবা সিলেটে ভ্রমণ করতে পারেন।

Biman
BANGLADESH AIRLINES
Your home in the sky

এখন ক্যানাডাসহ উত্তর আমেরিকার যে কোন শহর থেকে লন্ডন হয়ে সরাসরি সিলেট যাতায়তের ব্যবস্থা আমরা করে থাকি

জাতীয় এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণ করুন।

(বিমান অনুমোদিত এজেন্ট)

S.I. TRAVELS

(T.D. BANK BUILDING)
1410 GUY STREET, SUITE 19
MONTREAL, QUEBEC, CANADA, H3H 2L7
Tel : 514-931-4070
Fax : 514-931-1200

TOLL FREE FROM ANY CITY IN CANADA & USA : 1-877-936-1100

ব্যক্তিত্ব

প্রকৌশলী বিজ্ঞানী কৃতি বাংলাদেশী

ড: ফজলে হুসেইন

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এম.ই) বিষয়টির নাম শুনলে মনের ভেতর ঘড় ঘড় মেশিনের শব্দ সম্বলিত একটি যন্ত্রালয় আর যান্ত্রিক কিছু মানুষের চিত্র মনে ভেসে ওঠা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, পৃথিবীর একজন অন্যতম প্রকৌশলী ড. ফজলে হুসেইন এর সংস্পর্শে এলে একজন বৈজ্ঞানিক গবেষকের ভেতরের সাধারণ মানুষের চেহারার খোলসাবৃত এক অসাধারণ মানসিক শক্তি সম্পন্ন মানবমূর্তির দেখা মেলে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হলেও, ড. হুসেইন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) ও গণিত (Mathematics) নিয়ে কাজ করেন বলে, তিনি প্রকৌশলী ও বৈজ্ঞানিক এই দুই জগতেই সমানভাবে পরিচিত। একবার হিউস্টনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির ভাষণে বিশ্ববিজ্ঞানের অঙ্গনে অবদান রাখতে পারা এই বাংলাদেশী আজকের নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর বক্তৃতায় যা বলেছিলেন তা হয়তো অনেকেরই কর্মক্ষেত্রে ও প্রাত্যহিক জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, “কখনো বিখ্যাত হবার জন্যে কাজ করোনা, মনোযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাও, একদিন না একদিন তার ফল লাভ করবে।” এই ছোট্ট অথচ গভীর দর্শনের কথা এই বাঙালীর মনে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে তাঁর মেধার পাশাপাশি সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়।

বাংলাদেশের একটি সাধারণ পরিবারে অনেক ভাইবোনের মাঝে বেড়ে ওঠা এই বৈজ্ঞানিক ছোটবেলায় বৈদ্যুতিক বাতিহীন পরিবেশে পড়াশোনা করে বড় হয়েও আজকের একবিংশ শতকের রকেট ও মহাশুন্য বিজ্ঞানের যুগে যন্ত্র প্রকৌশল বিষয়ক গবেষণায় দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখার জন্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানিত পদকে ভূষিত হয়েছেন। এই পদকগুলো হলো, ১৯৯৬ সালে পাওয়া আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির (APS) ‘দ্যা ফ্লুইড ডাইনামিক্স প্রাইজ (The Fluid Dynamics Prize) এবং ২০০০ সালের এ.এস.এম.ই. (আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস) এর পদক ‘ফ্লুইড ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাওয়ার্ড’ (Fluid Engineering Award)। ১৯৯৬ সালে তিনি (পদার্থ বিজ্ঞানী আবদুস সালাম সহ বিশ্বের আরো অন্যান্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সংগঠিত) তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান একাডেমী, TRIESTE এর অন্তর্ভুক্ত হবার সম্মান লাভ করেন। গত বছর (২০০০ সালে) তিনি ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্সের সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনে ‘বিশেষ কালীন অধ্যাপক’ (Cullen Distinguished Professor) হিসেবে কর্মরত। এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর প্রকৌশল জীবনের শুরু ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশের

ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির (BUET) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে। সেখানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পড়াশোনার গবেষণার ফসল হিসেবে তিনি তৈরি করেন একটি সূর্যতাপ চালিত হিমযন্ত্র (solar refrigerator)। সেই থেকে বিজ্ঞানের জগতের আত্মপ্রকাশ এবং আজ অবধি প্রচন্ড বেগে এগিয়ে চলেছে তাঁর গবেষণা যা প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর বিজ্ঞানকে করছে সমৃদ্ধ। বুয়েট (BUET) থেকে বি.এস.এম.ই. (Bachelor of Science in Mechanical Engineering) ডিগ্রী লাভের পরপরই ১৯৬৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেকচারের পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। মাত্র দুবছরের মাথায় ১৯৬৫ সালে তিনি ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট পড়াশোনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য আজ পর্যন্ত ফুলব্রাইট বৃত্তি পৃথিবীর শিক্ষা ও গবেষণা অঙ্গনে এক দুর্লভ সম্মানের বাহক। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী শেষ করে ১৯৬৯

> *“কখনো বিখ্যাত হবার জন্যে কাজ করোনা, মনযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাও, একদিন না একদিন তার ফল লাভ করবে।”*

সালে ফজলে হুসেইন ড. উপাধি লাভের পাশাপাশি তাঁর অসাধারণ পি.এইচ.ডি. থিসিসের জন্যে 'Stanford Eckart Prize for Outstanding Ph.D. Thesis' পুরস্কার লাভ করে এক বিরল সম্মানে ভূষিত হন। তারপর আর এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, জনস্ হপ্‌কিন্স্ এ প্রায় দেড় বছর ভিজিটিং এসিসটেন্ট প্রফেসর (সহকারী অধ্যাপক) পদে বহাল থাকার পর ১৯৭১ সালে তাঁর বর্তমান গবেষণার স্থান, টেক্সাসের ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একই পদে শিক্ষকতা ও গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই থেকে ফ্লুইড মেকানিক্স গবেষণায় নিয়োজিত থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গতানুগতিক স্তর বিন্যাসের ধারা অতিক্রম করে অতি দ্রুত, মাত্র পাঁচ বছরের মাথার, ১৯৭৬ সালে এই প্রতিভাধর বাঙালী যুবক পূর্ণ অধ্যাপক বা Professor পদে উন্নতি লাভ করেন। পদোন্নতির পাশাপাশি তাঁর গবেষণার প্রসারের সাথে সাথে হিউস্টনের এই বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লুইড মেকানিক্স বিষয়ে গবেষণার জন্যে এই বিজ্ঞানীর বদৌলতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে

কর্মজীবনে তিনি প্রায় ৩০ জন পোস্ট ডক্টোরাল ফেলো ও ভিজিটিং স্কলারসহ বহু সংখ্যক আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে তাদের গবেষণার প্রধান দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন।

পঞ্চাশটি ফেডারেল এজেন্সীর গবেষণা গ্র্যান্ট ও Fluid Engineering, The Physics of Fluid, Optics Letters সহ আরো অনেক উচ্চ মর্যাদার (Peer Reviewed) বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় তাঁর প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট ও বহু বৈজ্ঞানিক সেমিনারে তাঁর গবেষণার উপস্থাপন, অধ্যাপনার পাশাপাশি ফ্লুইড মেকানিক্স গবেষণায় এই বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলীর বিশাল অবদানের একটি ধারণা দিতে পারে। প্রায় ২৩০টি আন্তর্জাতিক গবেষণা সেমিনারে নিজের গবেষণার ফল উপস্থাপন করা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ও আন্তর্জাতিক প্রায় শতাধিক সেমিনারে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেছেন তিনি। কর্মক্ষেত্রে ড. ফজলে হুসেইনের এই অবিস্মরণীয় অবদান ও সেই সাথে ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনের গবেষণার জন্যে বয়ে আনা এক সুন্দর ভবিষ্যৎ, বিশেষত: ফ্লুইড ডাইনামিক্স বিষয়ক গবেষণার বিশেষ সফলতা ও অগ্রসরতার ক্ষেত্র হিসেবে এই গবেষণাগারের খ্যাতি লাভের বিরল সুযোগ এনে দেবার জন্যে কৃতিত্বের পাশাপাশি এই কৃতি প্রকৌশলীর গবেষণার মূল্যায়ন করার জন্যে ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টন প্রায় গত দুই দশক যাবত উপর্যুপরী বারবার ডঃ হুসেইনকে বিভিন্ন সম্মানসূচক পদকে ও পদমর্যাদায় ভূষিত করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডঃ হুসেইনের প্রথম পুরস্কার ঘোষিত হয় ১৯৭৮ সালে। এই বিশেষ পুরস্কারের নাম ছিল 'Outstanding Engineering College Faculty Award'. তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে পাওয়া তাঁর অনেক পুরস্কারের মাঝে বিশেষ বিশেষ পুরস্কারসমূহ এখানে উলে-খ করা হলো। ১৯৮৫ সালে তিনি 'UH Senior Research Excellence Award' ও 'Distinguished University Professor' লাভ করেন, ১৯৮৯ সালে 'Cullen Distinguished Professor' এর মর্যাদা পান। ১৯৮৯ সাল থেকে এযাবত তিনি এই বিশেষ কালেন অধ্যাপকের পদে সমাসীন আছেন। এ.এস.এম.ই. এর পক্ষ থেকে তিনি পেয়েছেন 'Freeman Scholar Award' ও ১৯৯৬ সালে জনস্ হপ্‌কিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'The Johns Hopkins Society of Scholars' এ অন্তর্ভুক্ত হবার সম্মান লাভ করেন। ১৯৯৭-৯৮ সময়কালের জন্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে দেয়া 'Mid West Mechanics Lecturer' পদ লাভ করেন। ১৯৯৯ তিনি ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনের 'Sigma Xi Award' অর্জন করেন।

ডঃ ফজলে হুসেইনের পুরস্কার ও সম্মানের পরিধি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। ১৯৮০ সালে তিনি এন.এস.এফ. (ইউ.এস.এ.) (NSF, USA) এবং Council of Scientific & Industrial Research (India) এর যৌথ সমর্থনে US-india Exchange Scholar এর সম্মান লাভ করেন। Chinese Academy of Science, Beijing এই অসাধারণ বাঙালী বিজ্ঞানিককে ১৯৮৩ সালে Guest Scholar এর সম্মানে ভূষিত করে।

১৯৪৩ সালে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও চলছে। যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির উত্থান পতনের সামাজিক পরিবর্তনের পরিবেশে বড় হয়ে তিনি নিজেও শিক্ষা ও সমাজ অগ্রসরতার আন্দোলনে অবদান রাখতে ছাত্র রাজনীতির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি BUET এর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও সহ সভাপতি ছিলেন। ছাত্র রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক হলেও শিক্ষাঙ্গনের বাইরে এই আন্দোলন প্রসারের বিরোধিতা করেন তিনি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি ডঃ হুসেইন কখনো কখনো নিজ সংস্কৃতির ছোঁয়া নিতে পছন্দ করেন। হিউস্টনের টেগোর সোসাইটির তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও একসময় এই সাংস্কৃতিক সংগঠনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের ভূমিকায়ও কিছুদিন অবতীর্ণ ছিলেন। তিনি হিউস্টনের বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের একজন বিশিষ্ট সদস্য। সমাজ ও বিজ্ঞান সচেতন এই বিখ্যাত বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব যুগোপযোগী স্বাস্থ্য সচেতন সামাজিক জীবন যাপন করেন। তিনি নিয়মিত এরোবিক্স ও যোগ ব্যায়াম করেন। অবসরে তিনি ইউনির্ভাসিটি অফ হিউস্টনে ও ব্যালী টোটাল ফিটনেস সেন্টারে একজন স্বেচ্ছাসেবী ইয়োগা শিক্ষক হিসেবে কাজ করে সময় উপভোগ করেন। এসবই আমাদের কাছে এই অসাধারণ বাঙালী বৈজ্ঞানিকের গবেষক পরিচয়ের বাইরে তাঁর প্রকৃত মানুষ পরিচয়টি উন্মোচিত করে। ❐

নাহিদ রিয়ানন ও আজাদুল হক

(তথ্যাবলী ডঃ ফজলে হুসেইন অনুমোদিত)

যুক্তরাষ্ট্রের এফ১ ভিসা

জাকিয়া আফরিন

মেধাপাচার বাংলাদেশের ভবিষ্যতে ইতিবাচক না নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে'-এ বিতর্ক বহুদিনের। দেশের বাইরে থেকেও দেশের কাজ করা যায়-প্রবাসীরা মোটামুটি সবাই এ ধারণায় বিশ্বাসী। আর বাংলাদেশে বসে এ মত সমর্থন করছেন এমন মানুষ বিরল। তবে মতামত যাই থাকুক না কেন, বাস্তবতা হল বাংলাদেশে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল ব্যক্তিমাত্রই এখন সন্তানকে বিদেশে শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখে। দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মাত্রাতিরিক্ত অবনতি অথবা ব্যক্তিগত অর্জন-কারণ যাই থাকুক না কেন, আমেরিকার প্রায় সব অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাংলাদেশী ছাত্র। F1 ভিসা আমেরিকার স্বর্ণদুয়ার আমাদের জন্য উন্মুক্ত করছে উলে-খযোগ্য সংখ্যায়।

হাই স্কুল থেকে শুরু : আমাদের দেশে মূলত এইচ.এস.সি পরীক্ষার পর পরই শিক্ষার্থীরা আমেরিকায় ভর্তির প্রস্তুতি শুরু করে। দেশের টোফেল কোচিং সেন্টারগুলোর তখন রমরমা অবস্থা, তবে আগ্রহী হলে হাই স্কুল থেকেই আমেরিকান স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আমেরিকান যে কোনো পাবলিক হাই স্কুলে (9th to 12th grade) বিদেশী ছাত্র F1 ভিসার আওতায় পড়াশোনা করতে পারে। তবে পুরোটা বেতনই পড়া শুরুর আগে পরিশোধ করার প্রমাণ থাকতে হবে। ব্যাচেলরস্ ডিগ্রীর জন্য F1 ভিসা পেতে হলে সবচেয়ে দরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের I20। যে বিষয়ে শিক্ষার্থী পড়তে ইচ্ছুক, তার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইংরেজী ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ চায়। টোফেলে একটা ন্যুনতম স্কোর তাই ভর্তির জন্য অবশ্য দরকার। কোনো কোনো শিক্ষালয়ে অবশ্য ভাষা ট্রেনিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থাও থাকে। ছাত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা I20'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদেশী ছাত্রদের ভর্তি করার পেছনে ব্যবসার মানসিকতাটাই কাজ করে বেশি। তাই টিউশন ফি পুরোপুরি শোধ করার নিশ্চয়তা দিতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের I20 যোগাড় করা তত অসুবিধা নয়। তবে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

এ্যামব্যাসির যত কড়াকড়ি : বাংলাদেশে থেকে F1 ভিসা নিয়ে এসেছেন অথচ এ্যামব্যাসি নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই, এমনটা হওয়া প্রায় অসম্ভব। যত নামী দামী ইউনিভার্সিটির I20ই থাকুক বা টোফেলের স্কোর ৬০০ পার হয়ে যাক্ ভিসাটা নির্ভর করে এ্যামব্যাসির মন মেজাজের উপর। সাধারণত F1 ভিসা ইস্যুর জন্য তারা যা দেখতে চায়, তা হলো-

১. ইউনিভার্সিটির I20 ফরম;

২. টোফেল, জিম্যাট বা জিআরই (যার ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য) নম্বর;

৩. আমেরিকায় পড়াশুনা এবং থাকার খরচ যোগানোর সামর্থ আছে কিনা;

৪. শিক্ষার্থীকে নানাভাবে প্রশ্ন করে তারা নিশ্চিত হতে চায়, পড়াশুনা শেষ করে সে দেশে ফিরে আসবে কিনা।

একজন ছাত্র এ্যামব্যাসিতে দাঁড়ানোর সময় এ সবকিছুর জন্য ভাল প্রস্তুতি নিলেও নিশ্চিত হবার কিছু নেই। F1 ভিসা প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেয়ার অধিকার এ্যামব্যাসির রয়েছে। ইউনিভার্সিটির কিছুই করার নেই।

ভিসার মেয়াদ : প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং F1 ভিসার বিরাট সুবিধা। পড়াশুনা শেষ করার পর শিক্ষার্থী একবছর কাজ করার অনুমতি পায় এর মাধ্যমে। সাধারণত প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের কথা মাথায় রেখে ডিগ্রীর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের একবছর বেশি ভিসা ইস্যু করা হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে ভিসা দেয়া হয় এক বছরের। তবে কোনো কারণে শিক্ষার্থী সময়মত পড়া শেষ করতে না পারলেও সে অবৈধ হয়ে যায় না। যতদিন সে পড়াশোনা করবে, ততদিন সে বৈধ ভাবেই আমেরিকায় থাকতে পারবে। কোনো কারণে বাইরে গেলে তবেই অসুবিধা। আর এই যে পড়াশোনার সময়টুকু বৈধভাবে থাকা - এই অধিকার দেয় INS. আমেরিকায় প্রবেশের সময় একজন INS (ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারালাইজেশন সারভিসেস) অফিসিয়াল শিক্ষার্থীকে ইস্যু করে I-94 (Record of arrival-departure)। এতেই উলি-খিত থাকে বৈধভাবে থাকার অনুমতি। সাধারণত F1 ভিসার ক্ষেত্রে উলি-খিত থাকে 'Duration of study' কথাটি।

F1 এর অসুবিধা : F1 ভিসা ইস্যুর আগে শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা গুরুত্ব নিয়ে বিবেচনা করা হয়-এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সমস্যাটা ওখানেই। কাগজপত্রে স্বচ্ছলতা থাকলেও কেউ যদি সত্যিকার অর্থে সমর্থ না হয়, আমেরিকায় তার জন্য অপেক্ষা করছে অনেক অসুবিধা। F1 ভিসায় কাজের অনুমতি থাকে না। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কাজ করা যায়, তবে সেটি অতি অল্প সময়ের জন্য। পড়া শুরু করার এক বছর পর INS এর কাছে আবেদন করা যায়, কাজের অনুমতি চেয়ে, তবে তার সম্ভাবনাও অনেক কম।

অনুমতি নেই বলে কাজ পাওয়া যায় না, এমনটা অবশ্য নয়। তবে অবৈধভাবে কাজ করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে। এর জন্য আমেরিকা ত্যাগ করতে হতে পারে।

এটা শুরুর কথা : এ্যামব্যাসিতে দাঁড়িয়ে যে কথাই বলুক F1 ভিসা শেষ হলে দেশে ফেরে খুব কম শিক্ষার্থী। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের পর স্ট্যাটাস পরিবর্তন এক সময় শেষ হয় নাগরিকত্বে গিয়ে। হয়ত এই সুতো ছিঁড়তেই আজকাল F1 ভিসা নিয়ে এত কড়াকড়ি। তবে ভাল ইউনিভার্সিটির I20 আর ইংরেজীতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা দেখাতে পারলে হয়তো ওরাই চাইবে না আপনাকে ফিরিয়ে দিতে। ❒

স্যান হোজে, ক্যালফোর্নিয়া।